তাওহীদ পন্থীদের নয়নমণি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৯তম অধ্যায় - আল্লাহর নাম ও গুণাবলী থেকে কিছু অস্বীকার কারীর হুকুম (باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ আব্দুর রাহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ)

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী থেকে কিছু অস্বীকার কারীর হুকুম

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

‘‘এবং তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বলোঃ তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন’’। (সূরা রা’দঃ ৩০)

ব্যাখ্যাঃ এই আয়াতের শানে নুযুল সকলেরই জানা আছে। কুরাইশরা যখন অহংকার বশত আল্লাহর রাহমান নামকে অস্বীকার করল, তখন আল্লাহ তাআলা সূরা বানী ইসরাঈলের ১১০ নং আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

‘‘বলোঃ তোমরা আল্লাহ্কে ‘আল্লাহ’ নামে আহবান করো কিংবা ‘রাহমান’ নামে আহবান করো, তোমরা যে নামেই আহবান করো না কেন, তাঁর রয়েছে অনেক অতি সুন্দর নাম’’। সুতরাং রাহমান একই সাথে আল্লাহর নাম ও সিফাত। ‘রহমত’ সিফাতটি তাঁর সাথেই কায়েম রয়েছে। মুশরিকরা যখন আল্লাহর নামসমূহের এমন একটি নামকে অস্বীকার করল, যা আল্লাহর কামালিয়াতের প্রমাণ বহন করে, তখন সেই নামের অর্থকে অস্বীকার করা নামকেই অস্বীকার করার নামান্তর। অর্থাৎ রাহমান শব্দের মধ্যে যেই রহমতের অর্থ রয়েছে, তা অস্বীকার করা আর রাহমান নামটিকে অস্বীকার করা একই কথা।

জাহমীয়া সম্প্রদায় ধারণা করে যে, রাহমান শব্দটি আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিষ্ঠিত কোনো সিফাতের অর্থ প্রদান করেনা। এ ক্ষেত্রে মুতাযেলা ও আশায়েরা[1] সম্প্রদায়ের লোকেরাও জাহমীয়াদের অনুসরণ করেছে। এ জন্যই আহলে সুন্নাতের অনেক আলেম এদেরকে কাফের বলেছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেনঃ

+ ولقد تقلّد كفرهم خمسون في

عشر من العلماء في البلدان

+ واللالكائي الإمامُ حكاه عنـ

ـهم بل حكاه قبله الطبراني

‘‘বিভিন্ন শহরের পাঁচশত আলেম তাদের কাফের হওয়ার ফতোয়াকে সত্যায়ন করেছেন। ইমাম লালাকায়ী তাদের

থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন। তাঁর পূর্বে ইমাম তাবারানীও বর্ণনা করেছেন।

জাহমীয়া সম্প্রদায়ের এই লোকেরা এবং আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে যারা তাদের অনুসরণ করেছে, তারা আল্লাহ তাআলার ঐ সমস্ত পরিপূর্ণ সিফাত বা মহান গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে, যদ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের সত্তাকে গুণান্বিত করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও উহা সাব্যস্ত করেছেন। তারা নিজেদের পক্ষ হতে একটি ভ্রান্ত মূলনীতি বানিয়ে আল্লাহর সিফাতসমূহকে অস্বীকারের পথে অগ্রসর হয়েছে। আল্লাহর সিফাতগুলো থেকে তারা শুধু ঐ টুকুই বুঝেছে, যা মানুষের সিফাতের বৈশিষ্টের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ তারা প্রথমে আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করেছে এবং আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের মতই মনে করেছে। অতঃপর তারা আল্লাহর পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং তারা আল্লাহর পবিত্র সত্তাকে ত্রুটিপূর্ণ জিনিষ, জড়পদার্থ এবং অস্তিত্বহীন জিনিষের সাথে তুলনা করেছে।

মোটকথা তারা প্রথমে আল্লাহর সিফাতকে বান্দার সিফাতের সাথে তুলনা করেছে, পরে তা অস্বীকার করেছে। তৃতীয় পর্যায়ে এসে তারা আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যেক ত্রুটিযুক্ত বস্তুর সাথে অথবা অস্তীত্বহীন জিনিষের সাথে তুলনা করেছে। এর মাধ্যমে তারা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল এবং সালফে সালেহীনের মাজহাবকে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহর আসমা ও সিফাতের ব্যাপারে সালফে সালেহীনের মাজহাব হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ হাদীছে আল্লাহর জন্য যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, তাতে বিশ্বাস করা। সুতরাং তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্ব অনুপাতেই এই সিফাতগুলো তাঁর জন্য সাব্যস্ত। আল্লাহর গুণাবলীকে আল্লাহর জন্য এমনভাবে সাব্যস্ত করতে হবে, যাতে কোনো উপমা পেশ করা যাবেনা। এ কথা বলা যাবেনা যে, আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতই, তাঁর চোখ মানুষের চোখের মতই এবং আল্লাহর জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের মতই........... এবং তাঁর গুণাবলীকে পবিত্র ও দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে বিশ্বাস করতে হবে, যাতে কোন সিফাতকেই অস্বীকার না করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ لَيۡسَ كَمِثۡلِهٖ شَیۡءٌ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ‘‘তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা’’। (সূরা শুরা: ১১)

জাহমীয়া সম্প্রদায়ের বিদআত প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের বিদআতের প্রতিবাদ করার জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের ইমামগণ অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ, ইমাম খাল্লাল, আবু বকর আল আছরাম, উছমান বিন সাঈদ আদ্ দারামী, ইমামকুল শিরোমনী মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা, আবু উছমান আস্ সাবুনী এবং আরো অনেক সুন্নী ইমাম। তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাদের পরে যারা আগমণ করেছেন, তারাও অনেক কিতাব লিখেছেন। তাদের মধ্যে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ মুওয়াফ্ফাক উদ্দীন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এবং তাদের স্তরের অন্যান্য আলেম। এই স্তরের আলেমদের মধ্যে যারা জাহমীয়াদের প্রতিবাদে পুস্তক রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর, হাফেয বিন আব্দুল হাদী, ইবনে রজব, ইমাম যাহাবী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের অন্যান্য ইমামগণ। তাদের রচিত প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের হাতে বিদ্যমান রয়েছে। আলেমগণ সর্বদা হকের প্রকাশ, প্রচার-প্রসার, হকের দাওয়াত এবং এর হেফাযত করে যাচ্ছেন। এ জন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

«حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟»

‘‘লোকদেরকে এমন কথা বলো, যা তারা বুঝতে সক্ষম হয়। তোমরা কি চাও, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে তথা আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে মিথ্যা বলা হোক?’’[2]

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে কিস্সা-কাহিনী বর্ণনাকারীদের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি এই কথা বলেছেন। সে সময় তারা লোকদেরকে এমন এমন হাদীছ শুনাতে লাগল, যা মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলনা। এ কারণেই জাল হাদীছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরিচিত হাদীছের দু’টি অবস্থা হতে পারে। তাতে এমন হাদীছ থাকতে পারে, যা সহীহ। আবার এমন হাদীছও থাকতে পারে, যা সহীহ নয়। এ জন্যই যখন কোনো লোক এমন হাদীছ শুনত, যা তার কাছে পরিচিত নয়, তখন সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করত। কখনো অপরিচিত হাদীছ সঠিক হত। এ জন্যই মুহাদ্দিছ এবং ফকীহদের নিকট সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীছ ব্যতীত অন্যান্য হাদীছ বর্ণনা করা ঠিক নয়। যে হাদীছের অবস্থা এরূপ নয়, তা বর্ণনা করা উচিত নয়। কেননা এ ধরণের হাদীছ সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমীরুল মুমিনীন মুআবীয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন। কেননা তা বর্ণনায় অসতর্কতার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরো বলতেনঃ আমীর অথবা কিস্সা বর্ণনায় অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ কিস্সা বলতে পারবেনা।

আব্দুর রাজ্জাক মামার হতে, মামার ইবনে তাউস হতে, তিনি তার পিতা হতে তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীছ শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কেঁপে উঠছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ এরা আল্লাহ তাআলাকে কেমন ভয় করে? কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শুনে নরম হয়। আর যখন কোন অস্পষ্ট আয়াত শুনে তখন ধ্বংস হয় এবং তা অস্বীকার করে?’’

ব্যাখ্যাঃ আব্দুর রাজ্জাক হচ্ছেন মুহাদ্দিছ ইবনুল হুমাম আস্ সানআনী। তিনি ছিলেন ইয়ামানের মুহাদ্দিছ। তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তার অধিকাংশ বর্ণনা ইমাম যুহরীর শিষ্য মা’মার বিন রাশেদ থেকে। তিনি আব্দুর রাজ্জাকেরও শাইখ ছিলেন। মা’মার নিকট থেকে তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

মা’মার হচ্ছেন আবু উরওয়া বিন আমর রাশেদ আল-আযদী আল-হাররানী অতঃপর ইয়ামানী। তিনি ছিলেনঃ মুহাম্মাদ বিন শিহাব যুহরীর ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ইমাম যুহরী থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে তাউস হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন তাউস আল-ইয়ামানী। মামার বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস ছিলেন আরবী ভাষার অন্যতম বিজ্ঞ আলেম। ইবনে উয়ায়না বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস ১৩২ হিজরী সালে মৃত্যু বরণ করেন।

ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতার নাম হচ্ছে তাউস বিন কায়সান আল-জানাদী। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ একজন আলেম এবং ইমাম। কেউ কেউ বলেনঃ তার নাম যাকওয়ান। ইবনুল জাওযী এ কথাই বলেছেন।

আমি বলছি, তাউস বিন কায়সান ছিলেন তাফসীর শাস্ত্রের একজন ইমাম এবং জ্ঞানের ভান্ডার। তাহযীবুল কামালে ইমাম যুহরী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেনঃ আমি একবার আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট গেলাম।

আব্দুল মালেক তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে যুহরী তুমি কোথা হতে এসেছ? আমি বললামঃ মক্কা হতে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি মক্কায় কাকে রেখে এসেছো? কে মক্কাবাসীদের নের্তৃত্ব দিচ্ছে? যুহরী বলেনঃ আমি বললামঃ আতা বিন আবু রাবাহ। আব্দুল মালেক জিজ্ঞাসা করলেনঃ তিনি কি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? আমি বললামঃ মাওয়ালীদের।[3] তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তিনি কিসের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের নের্তৃত্ব দিচ্ছেন? আমি বললামঃ দ্বীনদারী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নাতের মাধ্যমে। আব্দুল মালেক বললেনঃ দ্বীনদার এবং সুন্নাতের অধিকারীদেরই নেতা হওয়া উচিত।

আব্দুল মালেক বললেনঃ ইয়ামান বাসীদের নেতা কে? আমি বললামঃ তাউস বিন কায়সান। আব্দুল মালেক বললেনঃ তিনি কি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? আমি বললামঃ তিনি মাওয়ালীদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তিনি কিসের মাধ্যমে তাদেরকে পরিচালনা করছেন? আমি বললামঃ আতা যা দিয়ে পরিচালনা করছেন, তিনিও তা দ্বারা পরিচালনা করছেন। অর্থাৎ দ্বীনদারী এবং হাদীছ বর্ণনার মাধ্যমে। আব্দুল মালেক বললেনঃ তাই হওয়া উচিত।

আব্দুল মালেক বললেনঃ মিশরবাসীদের নেতা কে? আমি বললামঃ ইয়াযীদ বিন আবু হাবীব। আব্দুল মালেক বললেনঃ তিনি কি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? আমি বললামঃ তিনি মাওয়ালীদের অন্তর্ভূক্ত।

আব্দুল মালেক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ সিরিয়া বাসীদেরকে কে পরিচালনা করছেন? আমি বললামঃ মাকহুল। তিনি বললেনঃ তিনি কি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? আমি বললামঃ মাওয়ালীদের। তিনি ছিলেন একজন নাওবী গোলাম। যাকে হুযাইল গোত্রের একজন মহিলা আযাদ করেছিল।

আব্দুল মালেক আবার প্রশ্ন করলেনঃ আরব উপদ্বীপের নের্তৃত্ব দিচ্ছে কে? আমি বললামঃ মাইমুন বিন মিহরান। তিনি বললেনঃ তিনি কি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? আমি বললামঃ তিনিও মাওয়ালীদের অন্তর্ভূক্ত।

আব্দুল মালেক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ খোরাসানের নেতা কে? আমি বললামঃ যাহ্হাক বিন মুযাহিম। তিনি বললেনঃ তিনি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? আমি বললামঃ মাওয়ালীদের।

আব্দুল মালেক জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে বসরাবাসীদেরকে পরিচালনা করছে? আমি বললামঃ হাসান বসরী। তিনি বললেনঃ তিনি কি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? আমি বললামঃ মাওয়ালীদের। আব্দুল মালেক তখন বললেনঃ অকল্যাণ হোক তোমার! কুফাবাসীদের নের্তৃত্ব কার হাতে? যুহরী বলেনঃ আমি বললামঃ ইবরাহীম আন নাখঈ। তিনি বললেনঃ তিনি কি আরবদের অন্তর্ভূক্ত? না মাওয়ালীদের? যুহরী বলেনঃ আমি বললামঃ তিনি আরবদের অন্তর্ভূক্ত। আব্দুল মালেক তখন বললেনঃ হে যুহরী! অকল্যাণ হোক তোমার! এতক্ষণে তুমি আমার পেরেশানী দূর করেছ। আল্লাহর কসম! মাওয়ালীগণ (অনারাবগণ) আরবদের নের্তৃত্ব করতেই থাকবে। এমন কি মাওয়ালীদের মর্যাদা বর্ণনায় মিম্বারের উপর খুতবা দেয়া হবে। আর আরবরা তখন মিম্বারের নীচে বসে তা শ্রবণ করতে থাকবে।

যুহরী বলেনঃ আমি বললামঃ হে আমীরুল মুমিনীন! দ্বীন তো এমনই। যে ব্যক্তি দ্বীনের হেফাযত করবে, সে নের্তৃত্ব লাভ করবে। আর যে দ্বীন পরিত্যাগ করবে, তার পতন হবে এবং সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

এরা আল্লাহ তাআলাকে কেমন ভয় করে? আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন এবং তাঁর মজলিসে যারা উপস্থিত হন, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তারা যখন কুরআনের কোনো মুহকাম আয়াত শুনে, তখন তাদের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং যখন তারা আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে কোনো

আয়াত শুনে তখন তারা নড়ে উঠে। মনে হয় তারা সেই আয়াতের অর্থকে অস্বীকার করছে। অথচ কারও ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবেনা, যতক্ষণ না সে কুরআনের শব্দসমূহ এবং তা থেকে যেই প্রকাশ্য অর্থ বুঝা যায়, তার প্রতি ঈমান আনবে। যে ব্যক্তি অর্থকে প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে, সে উক্ত আয়াতে বিশ্বাসী বলে গণ্য হবেনা; বরং সে ধ্বংস হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগেই কাদরীয়া সম্প্রদায়ের বিদআত প্রকাশিত হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছের কিতাবে তা বর্ণিত হয়েছে। কাদরীয়া ফির্কার অন্যতম আহবায়ক গায়লানকে হত্যা করা হয়েছে। সে যখন তাকদীর অস্বীকার করলো, তখন হিশাম বিন আব্দুল মালেক তাকে হত্যা করেছেন। এরপর জা’দ বিন দিরহাম কাদরীয়া সম্প্রদায়ের বিদআত প্রচার করলে তাকেও হত্যা করা হয়। খালেদ বিন আব্দুল্লাহ ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাযের পরপরই তাকে হত্যা করেন।[4]

ইমাম যাহাবী বলেনঃ অকী ইসরাঈলের সূত্রে আমাকে একটি হাদীছ শুনিয়েছেন। হাদীছটির ভাষা হচ্ছে, إِذَا جَلَسَ الرَّبُّ عَلَى الْكُرْسِي অর্থাৎ ‘‘যখন আল্লাহ তাআলা কুরসীতে বসলেন’’। এটি শুনে অকীর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি থরথর করে কাঁপতে লাগল। অকী এতে রাগ করলেন এবং বললেনঃ আমরা আমাশ এবং সুফিয়ানকে এই হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি। তাদের কেউই এটিকে অস্বীকার করেননি। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তাঁর কিতাবالرد على الجهمية তে এটি বর্ণনা করেছেন।[5]

আহলে বিদআতের প্রকৃত অবস্থা এবং কুরআনের আয়াতের অর্থের মধ্যে তাদের তাহরীফ (পরিবর্তন) আব্দুল্লাহ ইবনে আববাসের কথার অর্থকে সুস্পষ্ট করে দেয়। বিদআতীদের মূর্খতা ও স্বল্প বুদ্ধির কারণে, সঠিক পদ্ধতিতে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন না করার কারণে এবং ইসলামী শরীয়তের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে শরঈ ইলম না অর্জন করার কারণেই বিদআতের সূত্রপাত হয়েছে। বিশেষ করে ঐ সব আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন না করার কারণে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেছেন, যাদেরকে শরীয়তের দলীল সমূহের মধ্যে সমন্বয় করার তাওফীক দিয়েছেন, যারা দৃঢ়তার সাথে বলতেন যে, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী নয় এবং তারা মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট) আয়াতকে মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতের দিকে ফিরিয়ে দেন। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক স্থানেই এটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের তরীকা। এ জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার অগণিত প্রশংসা করি।

কুরাইশরা যখন শুনল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আল্লাহর গুণবাচক নাম ‘রাহমান’ উল্লেখ্য করেছেন তখন তারা ‘রাহমান’ গুণটিকে অস্বীকার করল। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেনঃ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

‘‘তারা রাহমানকে অস্বীকার করে’’। (সূরা রা’দঃ ৩০)[6]

ইবনে জারীর তাবারী আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদাহ অবস্থায় এই বলে দুআ করতেন, يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ মুশরিকরা তখন বললঃ এই লোক তো ধারণা করে, সে এক আল্লাহকেই ডাকে। অথচ সে তো দু’দু জনকে ডাকছে! তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

“বলোঃ আল্লাহ্ বলে আহবান করো কিংবা রহমান বলে ডাকো, যে নামেই আহবান করো না কেন, সব অতি সুন্দর নাম তাঁরই”। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১১০) এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) আল্লাহর কোনো নাম ও গুণ অস্বীকার করলে ঈমান চলে যায়।

২) সূরা রাদের ৩০ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

৩) যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা উচিত।

৪) অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করার দিকে নিয়ে যায়, তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ না বুঝার কারণেই অনেকের ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে।৫। আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত হাদীছ শুনে যে ব্যক্তির শরীর নড়ে উঠেছিল তার জন্য ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর কোনো একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

ফুটনোট

[1] - যারা আল্লাহর নাম ও সিফাত উভয়টিকে অস্বীকার করে, তারা হচ্ছে জাহমীয়া। যারা আল্লাহর নামগুলোকে স্বীকার করে, কিন্তু সিফাতগুলোকে অস্বীকার করে তারা হচ্ছে মুতাযেলা। তবে তাদের আরও এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।

আর আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর নামগুলোতে বিশ্বাস করে। সিফাতগুলোর মধ্য হতে কেবল সাতটি সিফাত বিশ্বাস করে। বাকী সিফাতগুলোর ব্যাখ্যা করে। এরাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আকীদার কিতাবগুলো পাঠ করার অনুরোধ রইল।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে হাদীছ শুনাল।

[3] – موالي (মাওয়ালী) শব্দটি مولى এর বহুবচন। মাওলা শব্দটি স্থান ভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে মাওলা বা মাওয়ালী শব্দটির অর্থ হচ্ছে আযাদকৃত গোলাম বা দাস। মাওয়ালীদের সম্পর্কে দুই ধরণের উক্তি পাওয়া যায়। (১) ইসলামের ইতিহাসে ঐ সমস্ত লোকদেরকে মাওয়ালী বলা হয়, যারা ছিল এক সময় আরবদের দাস। পরবর্তীতে তারা দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে। তাদেরকে মাওয়ালী বলা হত।

(২) তারা ছিল ঐ সমস্ত অনারব গোত্রের লোক, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতাধর কতিপয় আরব গোত্রের সাথে অথবা উমাইয়া শাসকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল।

তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে উপরোক্ত মত দু’টির যেটিই সঠিক হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসেনা। এখানে মূল কথা হচ্ছে উমাইয়া শাসনের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, রাজনীতি, যুদ্ধ ও জ্ঞান চর্চা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই মাওয়ালীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মাওয়ালীগণ উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। ইসলামী খেলাফাতের ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তারা ইসলামের অনেক খেদমত

করেছে এবং ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় আলেম রয়েছেন, যারা হাদীছ, তাফসীর এবং ইলমে দ্বীনের অন্যান্য শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইমাম যুহরী ও আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের মধ্যকার আলোচনা থেকে আমরা বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমের পরিচয় পেলাম। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলিমদের ইমামদের অন্তর্ভূক্ত। আরো যে সমস্ত মাওয়ালীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের আযাদকৃত গোলাম নাফে, মাইমুনা বিনতে হারিছের আযাদকৃত গোলাম সালমান বিন বাশশার অন্যতম। আফ্রিকা বিজয়ী মুসা বিন নুসাইরও ছিলেন মাওয়ালীদের অন্তর্ভূক্ত।

মূলতঃ ইসলামে সকল মানুষই সমান। তারা একই পিতা ও একই মাতার সন্তান। এতে কালো-সাদা, আরব-অনারব- এ জাতিয় ভেদাভেদ নেই। তারা সকলেই মাটির তৈরি মানুষ। ইসলামে ইলম, আমল, তাকওয়া, আচার-আখলাক ইত্যাদি সৎগুণাবলীর মাধ্যমেই কেবল তাদের একজন অন্যজনের উপর প্রাধান্য পেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

‘‘হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন’’। (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

ইসলাম দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষকে সমান করে দিয়েছে। আল্লাহর বিধানের সামনে সকলেই সমান। তবে ঈমান, আমল ও তাকওয়াই একজনকে অন্যজন থেকে পার্থক্য করেছে। যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং সৎ আমল করবে, আল্লাহ কেবল তাদেরকেই সম্মানিত করবেন এবং উত্তম বিনিময় দান করবেন। যদিও তারা হন সমাজের সর্বাধিক দুর্বল ও অসহায়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

‘‘যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিযিক দিবেন’’। (সূরা তালাকঃ ১১) আর যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করবে, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। যদিও তারা হন দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ও মর্যাদাবান। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

‘‘আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা"। (সূরা তাগাবুনঃ ১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সভাসদে বিভিন্ন গোত্র, জাতি ও বর্ণের লোক একত্রিত ছিলেন। তাদের সকলের অন্তর ছিল তাওহীদে পূর্ণ, ঈমান ও তাকওয়ার এক শক্ত বন্ধনে ছিলেন সকলেই আবদ্ধ। আবু বকর ছিলেন কুরাইশী, আলী ছিলেন হাশেমী, বেলাল ছিলেন হাবশী গোলাম, সুহাইব ছিলেন রোমী, সালমান ছিলেন ফারসী, উছমান ছিলেন ধনী এবং আম্মার ছিলেন দরিদ্র। একদিকে অঢেল সম্পদের অধিকারী অন্যদিকে আহলে সুফ্ফার দরিদ্র। সকলে এক সাথে একটি শক্তশালী মুসলিম জাতি গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই তো হাসান বসরী। তিনি ছিলেন মাওয়ালীদের অন্তর্ভূক্ত। ইলম, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে আরব-অনারব সকল মুসলিমের নিকটই সুউচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন।

[4] - বর্ণিত হয়েছে যে, জা'দকে হত্যা করার সময় খালেদ বিন আব্দুল্লাহ বলেছিলেন, হে মুসলিমগণ! তোমরা কুরবানী করো। আল্লাহ তোমাদের কুরবানী কবুল করুন। আমিই সর্বপ্রথম জা'দ বিন দিরহামকে কুরবানী করছি।

[5] - ইমাম আলবানী (রঃ) এই বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ মুখতাসারুল উলুউ, (১/৭৫)। আরশ বা কুরসীর উপর আল্লাহ তাআলার বসা বিশেষণ সাব্যস্ত নয়। কুরআনের যেসব অনুবাদে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন, তাতে ভাষাগত ভুল রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনদের বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আরশের উপর সমুন্নত। তিনি কিভাবে সমুন্নত হয়েছেন, তার কোনো ধরণ কারো জানা নেই। যেমন জানা নেই আল্লাহ তাআলার অন্যান্য সিফাতের ধরণ। আকীদাহ বিষয়ক বিভিন্ন কিতাবে আমরা এ বিষয়টি সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। পাঠকদেরকে তা পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

[6] - ইমাম বায়হাকী কিতাবুস সিফাতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, হাদীছ নং- ৮৬৭, ইমাম দারেমী স্বীয় কিতাব الرد على الجهمية তে বর্ণনা করেছেন, হাদীছ নং- ১০৪ এবং ইমাম তাবারীও বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সনদ মুরসাল হওয়ার কারণে তা সহীহ নয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12091

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন